শিক্ষা সমাজ দেশ

গর্ভস্থ সন্তানের ওপর হলুদ খাওয়ার প্রভাব

–ড. হাসনান আহমেদ

একজন বয়াতির মুখে প্রথম এ ধুয়োজারিটা শুনেছিলাম, 'ও তুমি এ কথা পেলে কোথায়, হলুদ খেলেই রাঙা ছেলে হয়?' ডাক্তাররা ভালো জানেন সন্তানের রংয়ের ওপর হলুদ খাওয়ার কোনো প্রভাব আছে কিনা। আমি শিক্ষক মানুষ। আমার মুরদ সীমিত। ছাত্র-ছাত্রীদের স্বভাব-চরিত্র, লেখাপড়ার ধরন ও পদ্ধতি, সাইকোলজি, ইতিহাস, অপরাজনীতি ও মানবিক চরিত্র হননের সামাজিক প্রভাব, বর্তমান সামাজিক পরিবেশ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি নিয়ে আমার চর্চা ও পেশাদারিত্ব; এগুলো খুটিয়ে খুটিয়ে দেখা, মুক্ত মতামত দেওয়া। মুক্ত বলছি এজন্য যে, মানুষ সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ট জীব। বিধাতা তাকে জ্ঞান-গরিমা, বিচার-বুদ্ধি ও পৃথক সত্তা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। স্বার্থের কারণে কোনো দল বা গোষ্ঠী কিংবা ব্যক্তি কারও অধীনস্থ বা আজ্ঞাবাহী হলেও প্রকৃতিগতভাবে মানুষ স্বাধীন সত্তার অধিকারী। একমাত্র স্বার্থের বিষয় এলেই এদের আসল রূপ চেনা যায়। আমিও আমার বিচার-বুদ্ধি, উপলব্ধি ও চিন্তা-চেতনার নাটাই কোনো রাজনৈতিক দলের নিগড়ে না বেঁধে মুক্ত আকাশে স্বাধীনভাবে উড়তে চাই; এটা আমার প্রকৃতি।

হলুদের সাথে সন্তানের রংয়ের প্রভাব থাক বা না-থাক, আইন সংশোধন বা সংস্কার করলেই সব চোর-ডাকাত, মিথ্যাবাদী-জোচ্চর সমাজে ভালোভাবে চলাফেরা করবে, সুচিন্তা মাথায় আনবে এবং চুরি-চামারি, ঘুষ বাণিজ্য, চাঁদা বাণিজ্য, রাজনৈতিক ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ হয়ে দেশ শনৈঃ শনৈঃ উন্নতির মগডালে পৌঁছে যাবে, একথা কল্পনাতে ভাবতে পারি, বাস্তবে নয়; যদিও আইন সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কারণ এদেশের রাজনীতিকরা দীর্ঘবছরের অপশাসনে ও স্বার্থোদ্ধারে মানুষ নামের সম্পদ একেবারে নষ্ট করে ফেলেছে। বিড়াল যদি বলে, 'মাছ-মাংস আর ভাল্লাগে না, আমি কাশীতে তীর্থস্নানে যাবো'– একথাও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? কর্মের প্রতি জীবের স্বভাবের একটা প্রভাব কি ভুলে যেতে হবে? স্বভাব নষ্ট করা অনেক সহজ, সুস্থাবস্থায় ফিরিয়ে আনা কি এতই সহজ? আবার আইন তৈরি করা সহজ, বর্তমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা অনেক কঠিন। কারণ সামাজিক অবক্ষয়, নীতি-নৈতিকতা, সুশিক্ষা, মূল্যবোধ ইত্যাদির ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। আইন তৈরিতে এসব ফ্যাক্টর বিবেচনা করতে হবে।

এত কথা বলার প্রয়োজন পড়ছে, আঠারো মাসের মধ্যে কয়েকটা বিভাগ সংস্কার করে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে রাজনীতিকদের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে বিদায় নিতে হবে, এ সময়সীমা বেঁধে দেওয়ার কারণে। আমার বিশ্বাস, রাজনীতিবিদদের তর সইছে না সরকারি দল বা বিরোধী দলে গিয়ে দেশ পরিচালনার জন্য। আমার মনে হয়, দোষ কারো নয়, দোষ আমাদের কপালের। কথায় আছে, 'কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন'। আমার আরো সন্দেহ হয়, অপরাধীদের সুষ্ঠু বিচারকার্য সম্পন্ন হয় কীনা! অত ধৈর্য আমাদের কোথায়? মূলত আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি। অতীতে আমরা বারবার তা প্রত্যক্ষ করেছি। আমাদের পূর্বানুমান করা কঠিন। তখন বলা হবে: পতিত সরকার এমন কী-ইবা ক্ষতি করেছে! উন্নয়নের নামে কোষাগার লুট, ব্যাংক লুট, টাকা পাচার, মিথ্যাচারিতা, খুন-গুম, নির্যাতন, গায়েবি মামলা, নির্বাহী-আইন-বিচার বিভাগ নিয়ে যথেচ্ছাচার, গণহত্যা; এ আর তেমন কী? একাকী তো করেনি, করেছে গোষ্ঠীসুদ্ধ। এছাড়া দেশের স্বার্থকে পাশ্ববর্তী দেশের চরণে বিসর্জন দেওয়া? তাদের হাতে ক্ষমতা ক্রমশ ছেড়ে দেওয়া? তাদের শক্তিতে শক্তিশালী হওয়া? ইত্যাদি। পদে থাকতে গেলে প্রতিবেশীকে একটু-আধটু সুবিধা তো দিতেই হয়, আমরা না খুব উদার জাতি! বিপদে-আপদে তাদের আশ্রয়ে থাকতে পারি, এইবা কম কী! 'এই হোক মোর শেষ পরিচয়, মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,' আমি তাদেরই লোক। রাজনীতিতে টিকে থাকতে গেলে, অবাধে অর্থ কামাই করতে গেলে কতকিছুই-না করতে হয়, এ আর তেমন কি! আমি তো তোমাতে সঁপেছি প্রাণ, সেই প্রথম থেকে এই বর্তমান।

পতিত সরকার পালিয়ে যাবার পর তাদের কারো কারো বাড়িঘর ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। আমরা দেখেছি ও পত্রিকায়ও পড়েছি। এত দিনে ভুলে গেছি, '৯৬ অথবা ২০০৬ সালে বিএনপি ক্ষমতা ছাড়ার পরপরই সেই রাতে ব্যবসা-বাণিজ্য লুটপাট, বাড়িঘর ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ আমরা কম দেখিনি। বরং সেই তুলনায় এবার কম হয়েছে। আমাদের ভাবখানা এরকম যে, 'আমি যা করি তা তোমরা কোরো না, আমি যা হেদায়েত করি তা তোমরা করো'। এটা আমাদের জাতীয় ব্যাধি, 'পরের বেলায় মুচকি হাসি, নিজের বেলায় চুপটি আসি'। রাজনীতিকদের আরেকটা ব্যাধির কথা বলা প্রয়োজন, '৮১, '৯১, '৯৬, ২০০১, ২০০৯ সাল পর্যন্ত একটা ধারা আমরা লক্ষ করেছি, ক্ষমতা হাতে পাওয়া মাত্র অভ্যন্তরীণ কোন্দল, এলাকার দখল-চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও অবৈধ হাজারো ব্যবসা-বাণিজ্য (যেমন–রাজধানীর শত শত টেম্পোস্ট্যান্ড থেকে প্রতিদিন কোটি কোটি টাকার চাঁদা ওঠানো) নিয়ে নিজ দলের মধ্যে মারামারি, লাঠালাঠি, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রক্তারক্তি শেষে শক্তিশালীর কাছে দুর্বল পক্ষ হার মানে; নিজেদের মধ্যে একটা অলিখিত আপসরফা হয়ে যায়। কে কত অংশ পাবে, কোন কাজ কার দখলে থাকবে, অদৃশ্যপটে মিটমাট হয়ে যায়, ক্ষমতা ও ব্যবসা-বাণিজ্য, চাঁদা আদায় চলতে থাকে। এসব টাকা কয়েকভাগে ভাগ হয়ে বিভিন্ন পক্ষের পকেটে যায়। এমন অদৃশ্য আদায় ও ভাগাভাগি নিয়ে বোঝাবুঝি শুধু রাজধানী নয়– জেলা, উপজেলা ও স্থানীয় এলাকা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। এবার রাজনৈতিক দল এখনোও ক্ষমতায় আসার আগেই পত্রিকার পাতায় বা কানে খবর আসছে যে, এলাকা দখল, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্পট দখল ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। এতে আমি আশ্চর্যান্বিত হইনি। আমরা খালি চোখে দেশের ঘটনার আংশিক দেখি; আন্ডারওয়ার্ল্ডের খবর ভিন্নরূপী। জানলে ও বুঝলে চোখ চড়কগাছে উঠে যায়। এটা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতি। এদেশে রাজনীতি মানে তো দেশসেবা, সমাজসেবা আদৌ নয়; রাজনৈতিক ব্যবসা, লাঠিয়াল বাহিনীর ক্ষমতাধিষ্ঠিতকরণ, সরকারি ও বেসরকারি বাহিনীর রুজি-রোজগারের অনুসন্ধান, ক্ষমতার দাপট, লুটতরাজ ইত্যাদি। শুধু ডিগ্রী অব পারফরম্যান্স কম বা বেশি অথবা অতিবেশি। প্রশ্ন জাগে, এ জাতি কি এ ব্যামো থেকে কোনোদিনই মুক্তি পাবে না?

আমিই তো ত্রিশ বছর আগে আমার বাচ্চাটাকে এক হাত ধরে হাঁটা শেখাতাম, তাকে নিয়ন্ত্রণও করতাম; তারপর সে ক্রমশ হাঁটা শিখে ফেলেছিল। সেজন্যই কয়েকদিন আগের লেখায় নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগকে আগে সংস্কার করে ঢেলে সাজাতে বলেছিলাম। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদ চেয়েছিলাম পাঁচ বছর। এর কারণও ছিল। এ সময়টা মূলত রাজনৈতিক দলের সংস্কার, নিয়ন্ত্রণ, জবাবদিহিতা, দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা ও চর্চার জন্য। এর সাথে সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শুধু সিলেবাস পরিবর্তন, মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তনই নয়, পুরো শিক্ষাব্যবস্থারও ব্যাপক সংস্কার জরুরি। এ নিয়ে অনেক কথা আছে। নইলে 'অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল'।

আমি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করছি না। কিন্তু পরিবর্তিত আইনের বাস্তবায়ন যথাযথ হয় না। দেশের রাজনীতিকদের সবাই খারাপ এ কথাও বলছি না। তবে ভালো-সুস্থ চিন্তা করার নেতা কম, যা আছে তা দিয়ে দেশ চলে না। সুস্থ পথে চলার কর্মী নেই বললেই চলে। নেতা এবং কর্মীরা বেঁধে-দেওয়া শৃঙ্খলার গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে অভ্যস্ত নয়। গুরু দাঁড়িয়ে পেশাব করলে শিষ্যরা আবার পাক দিয়ে নাচে। তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। গুরুরা জেগে ঘুমায়। এ থেকে পরিত্রাণ পাবার ব্যবস্থাও আমার জানা আছে। সংস্কারের সাথে অবিরাম নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা মজবুত করা অপরিহার্য। কিন্তু রোগীরা ওষুধ খেতে চায় না, ব্যবস্থাপত্রও ছিঁড়ে ফেলতে চায়; স্বাধীনভাবে চলতে চায়। রাজনীতিকরা দেশটা শুধু তাদের ভাবে। এতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। দেশচালকদের চিন্তাভাবনা ও কর্ম যদি সমাজসেবা, দেশগড়া ও জনসেবার অনুকূলে না হয়, খায় খায় মনোভাবের হয়; আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাতে সময় লাগে না। এসব তো আমরা বাস্তবে বারবার দেখে চলেছি। আইন তো লেখা থাকে বইতে, সংশ্লিষ্ট পক্ষের যোগসাজশে না মানলে করার কী আছে! এদেশের রাজনীতিতে মানুষের মতো মানুষের বড্ড সংকট।

তবে সংবিধান পরিবর্তন করে কিছু নতুন ব্যবস্থা ও আইন তৈরি করার গুরুত্ব আমি আগের লেখাতেও লিখেছি। আইন সংস্কারকরা সেদিকে নজর দিলে তো! নতুন ব্যবস্থায় অপরাজনীতি ও লুটপাট নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাদের কর্মকাণ্ডের অবিরাম সুপারভিশন থাকবে। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই তা থাকবে। সরকার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনতে হবে। সরকার হবে দলীয়, রাষ্ট্র হবে নির্দলীয়। রাষ্ট্র পরিচালনা একজনকে দিয়ে না করিয়ে পরিচালনার জন্য একটা নির্দলীয় 'সুপ্রিম কাউন্সিল' থাকবে। কাউন্সিলের সদস্যরা নির্দিষ্ট নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন। নির্বাহী বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগ পরিচালনার কিছু ক্ষমতা কাউন্সিলের হাতে থাকবে। রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো কাউন্সিলের হাতে থাকবে। কাউন্সিল সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ২/৩ মেজরিটির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে। কাউন্সিল আরও কিছু নির্দলীয় সদস্যের সাহায্য নিয়ে অন্তবর্তীকালীন সরকারে থেকে নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচন পরিচালনা করবেন। কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মী বেআইনী কিছু করলে সংশ্লিষ্ট দলকেই কাউন্সিলের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সরকারি দলের কর্মকাণ্ড ও অপকর্মও কাউন্সিল মনিটরিং করবে। এমপিদের নিজ এলাকার উন্নয়নে টাকা ভাগাভাগির কাজ থেকে দূরে রাখতে হবে। তারা যেন সরকারি ও সাধারণ মানুষের টাকা নিজের পকেটে না তুলতে পারে এবং একইভাবে কর্মীবাহিনী বা খাদকের দল পুষতে না পারে, সে বিধান রাখতে হবে। রাজনীতিতে টাকার খেলা বন্ধ হলেই সুশিক্ষিত ও সৎ চরিত্রের লোক ক্রমেই রাজনীতিতে আসবে। তখনই এদেশের মানুষ মুক্তি পাবে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ১৪ দল বাদে অন্য সব দল একজোট হয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে দেশের অনেক মঙ্গল হতো। এ সময়ে একতাবদ্ধ হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া প্রত্যেক দল অভ্যন্তরীণ শুদ্ধি অভিযান আন্তরিকভাবে পরিচালনা করলে আমরা বুঝতাম যে, তারা দেশের মঙ্গল চায়। অন্যথায় হলুদ যতই খাওয়া হোক, রাঙা ছেলের স্বপ্ন সুদূরপরাহত এবং সবকিছুকে 'কপালের দোষ' না দিয়ে আমি নিজেদের কর্মদোষ ও ভাবনাদোষকে দায়ী করতে চাই।

তেমনিভাবে বিএনপির আগের প্রচার অনুযায়ী, আগামী নির্বাচনে সমঝোতার ভিত্তিতে অন্তত দুটো মেয়াদের জন্য আন্তঃভেদাভেদ ভুলে গিয়ে শুধু দেশের স্বার্থে 'জাতীয় সরকার' গঠন করলে সত্যিকারভাবে দেশ গড়া সম্ভব। এতে এক দলের নেতা-কর্মীদের ভুল অন্য দল যেমন ধরিয়ে দিতে পারবে, তেমনি রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় থাকবে। আমি চাই প্রতিটি দলই যেন অতীতের ভুলগুলো থেকে শিক্ষা নেয় এবং অতীতের ভুল আর না করে। রাজনৈতিক দলের মধ্যে আন্তঃবিরোধ ও বিভাজন ভিনদেশি সম্প্রসারণবাদী শক্তির হাতকে শক্তিশালী করা ছাড়া এতে দেশের কোনো লাভ নেই এবং পরাজিত-পতিত শক্তিকে যেনতেনভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে বর্তমান দলগুলোকে তাদের চূড়ান্ত স্বার্থোদ্ধারে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমি নিশ্চিত হয়েই কথাগুলো বলছি। ভিনদেশি শক্তি অতীতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলো আনত, বর্তমানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও ঠিক একই অভিযোগ আনছে। এতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য ভাবনার অনেক কিছু রয়ে গেছে। আমরা যদি বাংলাদেশিদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সামষ্টিক উন্নতির কথা না বিবেচনা করে যার যার দলীয় স্বার্থের বিচারে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করতে চাই, তাহলে সেটা নিশ্চিতভাবেই বড় কোনো ক্ষতির আশঙ্কাকেই ত্বরান্বিত করবে। তখন ষাটের দশকে দেখা রূপবান ছায়াছবির গানই আবার মনে পড়বে, 'শেষের দুঃখ কাঁদলে সারবে না শেষের দুঃখ, ও কাঁদলে সা-আরবে না'। যে জাতি তার অতীত ভুলে যায়, সে জাতি আসলেই নিঃস্ব।

(৩ অক্টোবর '২৪ দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ এফসিএমএ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ